উত্তরবঙ্গের আদিবাসী

বঞ্চনার শিকার

সরেজমিনে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহান, রাজোয়ারসহ বিভিন্ন আদিবাসীদের গ্রামগুলো ঘুরে দেখা গেছে সর্বত্র উচ্ছেদ-আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের নিঃস্ব, বিতাড়িত করতে সর্বমহলের চেষ্টা চলছে ...

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার বসবাসরত আদিবাসীরা বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম করে চলছে। নিজ গ্রামেই আজ তারা পরবাসী হয়ে পড়ছে। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রভাবশালী বাঙালিরা নানা কৌশলে জমি কেড়ে নিয়েছে। এখন নিজের জমিতেই আদিবাসীদের শ্রম বিক্রি করতে হয়। নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর গ্রামের জ্যোতিন পাহানের ৫ বিঘা জমি কয়েক শত টাকা ধারের বিনিময়ে জনৈক স্থানীয় আব্দুস সালাম লিখে নিয়েছে। রমেশ পাহানের ৬০ বিঘা জমি সবই এখন বেদখলে চলে গেছে। সব হারিয়ে সে আজ নিঃস্ব। খরস্রোতা আত্রাই নদীর পাড়ের দেওয়ানপুর গ্রামের ওরাও সম্প্রদায়ের গোরস্থান পার্শ্ববর্তী লতিবপুর ইউনিয়নের বাঙালি সম্প্রদায় দখলের জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নওগাঁর নেয়ামতপুর ইউনিয়নের রাজোয়ার সম্প্রদায়ের পুরাউল গ্রামটি জনৈক রইজ মিয়া লিজ নিয়েছে বলে দাবি করছে। এখন সে কয়েকশ' বছরের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে রাজোয়ার সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের চলে যেতে বলছে। গ্রামের সরল মানুষগুলো আতঙ্কে এখন দিন কাটাচ্ছে। আসর গ্রামের সাঁওতালদের বসতবাড়ি পুকুর নাচোলের ইসুমিয়া খাস জমি দেখিয়ে একতরফা ডিগ্রি এনেছে। পুলিশ নিয়ে সে সাঁওতালদের উচ্ছেদে এসেছে। সাঁওতালরা গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। রাজশাহীর গোদাগাড়ি ইউনিয়নের আদিবাসীরা আতঙ্কে রয়েছে। কয়েক বছর ধরে বসবাসরত। ভিটামাটি এখন তাদের না বলে আদালত রায় দিয়েছে। নিজ বাড়ির আম পাড়ার দায়ে ৯ জন সাঁওতাল যুবককে ৬

মাসের জেল খাটতে হয়েছে। এখনও তাদের ওপর মামলার খড়্গ ঝুলছে।

সরেজমিনে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহান, রাজোয়ারসহ বিভিন্ন আদিবাসীদের গ্রামগুলো ঘুরে দেখা গেছে সর্বত্র উচ্ছেদ-আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের নিঃস্ব, বিতাড়িত করতে সর্বমহলের চেষ্টা চলছে। আদিবাসী গ্রামে বাড়ছে বাঙালি বসতি। প্রভাবশালী বাঙালিরা আদিবাসী জমি খাস দেখিয়ে নিজ নামে লিজ নিচ্ছে। থানা থেকে পুলিশ আসছে অবৈধ ডিগ্রিধারীর পক্ষে হয়ে আদিবাসীদের পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে। থানা ও স্থানীয় বহিরাগত বাঙালিরা মিলে আদিবাসীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে চলছে। সাজানো বুঝেও আদালতের বিচারপতি আদিবাসীদের জেল, জরিমানা করছে। মূলত আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিলীন করতে সবাই যেন তৎপর। আদিবাসীদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলোরও এ অঞ্চলে নেই তেমন ভূমিকা। তারাও যেন নীরব দর্শক। তবে আশার কথা, কয়েকটি এনজিও আদিবাসীদের আইনী, নৈতিক সমর্থন দিতে এগিয়ে এসেছে।

সাঁওতাল, ওঁরাও পাহান : এদেশের ভূমিজ সন্তান

আর্যপূর্ব বাংলায় অস্ট্রিক, মঙ্গোলিয়েড, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী বসতি গড়ে তোলে। ঐতিহাসিকদের মতে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে বৈদিক যুগের শেষ ভাগে। খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে। মূলত আর্যদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য মেনে না নিয়ে অনেক জাতিগোষ্ঠীর বাংলার পাহাড়, বন, জনবসতিহীন প্রান্তে স্থান নেয়। মূলত আর্য কাব্যগ্রন্থগুলোয় এ জাতিগোষ্ঠীগুলোকেই অস্পৃশ্য জাতি বলে তুলে ধরা হয়েছে। নৃ-তাত্ত্বিকদের মতে উত্তরবঙ্গের জাতিগোষ্ঠীগুলো মূলত আর্যপূর্ব উপমহাদেশের বসতকারী জাতিগোষ্ঠী।

উত্তরবঙ্গে ১২টি জাতিগোষ্ঠী বাস করে। তার মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নৃ-তাত্ত্বিক বিএস গুহ তার 'An Outline of the Racial Ethnology of India' গ্রন্থে বলেছেন, প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর শ্রেণী বিভাগ ব্যাখ্যা করে আধুনিক নৃ-তত্ত্ববিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে সাঁওতালরা আদি অস্ট্রেলিয়া গোষ্ঠীর মানব। এই শ্রেণীর মানব এক সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে আর্যদের আগমনের আগেই এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক হান্টারের মতে, সাঁওতালরা পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সাঁওতালদের প্রধান দেবতা সূর্য। এ কারণে তাদের মধ্যে সংস্কার রয়েছে তারা সূর্যোদয়ের দেশ থেকে এসেছে। উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ছাড়াও ওরাও, রাজোয়ার, মুন্ডারী, মালো, পাহাড়-পাহাড়িয়া জাতিগোষ্ঠী বাস করে। এরা সবাই আদি অস্ট্রেলিয়াড জনগোষ্ঠীর মানব বলে নৃ-তাত্ত্বিকেরা ধারণা করলেও, এদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ঐতিহ্য, আলাদা ভাষা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায় আদিম মানুষের সারল্যতা বজায় রেখেছে। তাদের খুবই সহজ-সরল জীবন। তবে তাদের রয়েছে সংগ্রামী অধ্যায়। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিয়ত সংগ্রাম। ব্রিটিশ শাসনামলে নীলকর, জোতদারের অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে গর্জে ওঠে সাঁওতালরা। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতাল ঢাল, তলোয়ার, তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চারদিকে আক্রমণ চালিয়ে তারা ব্রিটিশ সরকারের অফিস, নীলকর কুটির, জমিদার, জোতদারের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সরকার তখন বিদ্রোহ দমনে সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় সামরিক আইন জারি করে। বিদ্রোহী সাঁওতালদের দমন করতে ব্রিটিশ সরকার শক্তিশালী ফৌজ বাহিনী পাঠায়। অবশেষে কামান ও রাইফেলের গুলিতে ধনুর্ধর সাঁওতাল যোদ্ধারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে। জানা যায়, এ হামলায় ১০ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। সাঁওতালদের এ বিদ্রোহ উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনা জাগিয়ে তোলে। নাচোলের ইলা মিত্রের কৃষক আন্দোলন উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মনে আজও দাগ কেটে রেখেছে। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা বাঙালির কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধ করেছে। অথচ কোনো সংগ্রামের সফলতা তাদের ভাগ্য ফেরাতে পারেনি। বরং তারা নিঃস্ব, রিক্ত হয়েছে।

প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের দিন কাটছে অনিশ্চয়তার মধ্যে

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনেগাষ্ঠীগুলো জনমানবহীন নদী সমতলে বসবাস শুরু করেছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলে শক্ত লাল মাটিতে তারাই প্রথম আবাদ শুরু করে। প্রাক ব্রিটিশ আমলে এ জমির ওপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদার, জোতদার প্রথা প্রবর্তনের কারণে প্রথম উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা খাজনার নামে তাদের জমি হারাতে শুরু করে। আদিবাসীদের বিদ্রোহের কথা চিন্তা করে ব্রিটিশ সরকার ভূমিস্বত্বের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন প্রবর্তন করে। এতে জমির ওপর আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। Bengal Tenancy act 1885 এতে জমির ভোগ দখলের সত্ত্বেও অর্জিত অধিকার নির্ধারণে স্থানীয় রীতি পদ্ধতি বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়। ১৯২৮ সালের সংশোধিত প্রজাসত্ব আইনে এই নিয়ম বজায় রেখে আরো বলা হয়, ১২ বছর একটানা ভোগ দখলের সূত্রে যেকোনো জমির ওপর রায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯০৮ সালে ছোট নাগপুর প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের অনুমতি ভিন্ন জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৮ সালের বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৫০ সালের স্টেট অ্যাকুইজেশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট (SAT) মাধ্যমে এই আইন বহাল রাখা হয়। SAT-এর ৯৭ নং সেকশনে স্পষ্টভাবে আদিবাসীদের অর্জিত ভূমির ওপর রায়তি স্বত্বকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়া হয়। বলা হয়, আদিবাসীদের কাছে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন স্পষ্টভাবে নিতে হবে। আইন থাকলেও আইনের কার্যত প্রয়োগ নেই।

মূলত দেশ বিভক্তির পর উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের সমস্যা তীব্র হতে থাকে। এ সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী এসে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে বসতি স্থাপন করে। তারা আদিবাসীদের গ্রাম ও জমিতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। নাচোলের কৃষক বিদ্রোহে অনেক আদিবাসী ঘর ছাড়া

হয়। '৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেকেই দেশ ছাড়ে। '৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরীহ আদিবাসীরা জমি, বাড়ি রেখে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সুযোগে দখল হয়ে যায় তাদের জমি। দেশ স্বাধীনের পর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক নির্যাতন কমেনি বরং বেড়েছে। এ কারণে উত্তরবঙ্গের কয়েক লাখ আদিবাসী আজ অমানবিক জীবন যাপন করছে। তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার সবাই কেড়ে নিতে সদা উদ্যত।

সরজমিনে আদিবাসী পল্লী

ঢাকা থেকে নওগাঁ জেলা শহর। এ শহর থেকে বাসে আরো দুই ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে মহিনগর ইউনিয়নে পৌঁছাই। মহাদেবপুর উপজেলার এ ইউনিয়নে পাহান, ওরাও সাঁওতালদের আদিবাস। কুমির গাহ গ্রামে বাস করে পাহান সম্প্রদায়ের লোক। কৃষি কাজই তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ। পুরুষ, নারী উভয়েই জমিতে কাজ করে। এ গ্রামের বাসন্তী পাহান বললেন, 'তার নিজের জমি ছিল। ১০/১৫ বছর আগেই বাঙালিরা জমিগুলো দখল করে নিয়ে গেছে। এখন অন্যের জমিতে শ্রম দিতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ পাহান ভূমিহীন।' এ গ্রামে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা অক্সফেমের আর্থিক সহায়তায় প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছে। এ স্কুলে আদিবাসী শিক্ষক দিয়েই তাদের সন্তানদের বাংলা, আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। যাতে সরকারে প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে ভাষাগত সমস্যায় পড়তে না হয়। মাটির একটি বড় ঘরে স্কুলটি গড়ে উঠেছে। ওঁরাও পাহান শিশুরা গোল হয়ে বসে বাংলা পড়ছে। শিক্ষিকা তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে বাংলা শিখাতে চেষ্টা করছেন। স্কুলে আগত সব আদিবাসীর সন্তানদের মধ্যে তীব্র দারিদ্র্যতার ছায়া ফুটে উঠেছে।

নূরগ্রামের জ্যোতিন পাহান। বয়স ৫০ উর্ধ্ব। তিনি জানান, অভাবের তাড়নায় মাঝে মাঝে বাঙালিদের কাছ থেকে বাকিতে চাল এনেছেন। সামান্য টাকা ধার এসেছেন। শোধ করতে না পারায় জমিগুলো তাদের লিখে দিতে হয়েছে। বিবর্ণ মুখে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখালেন, এ জমিগুলো এক সময় সবই তার ছিল। এখন দু-এক বিঘা জমি আছে। তাও এখন দখলের চেষ্টা চলছে। তিনি বললেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশে ফিরে ভীষণ অভাবে পড়ি। ৫/১০ সের চালের বিনিময়ে জমি দিয়ে দিতে হয়েছে। আমরা তো অনেক কিছুই বুঝি না। পাশের গ্রামের রহমান, আব্দুল সালাম, মতিউর কৌশলে তার জমিগুলো নিয়ে নিয়েছে।' তিনি বলেন, দুবেলা এখন খেতে পারি না। এখন তো মন্দা। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উপাস থাকতে হয়।

নজিপুর ইউনিয়নের উড়িরপুর প্রাথমিক স্কুলে আদিবাসী সন্তানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুলক কুমার মন্ডল বললেন, আদিবাসীদের সন্তানেরা স্কুলে এসে অসহায়ত্ব বোধ করেন। কারণ ভালো বাংলা না জানায় পাঠ্য বইয়ের পড়া ধরতে কষ্ট হয়। এ কারণে ঝরে পড়ে অনেকে। তবে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় হওয়ায় ঝরে পড়ার সংখ্যা কমেছে।' আত্রাই নদীর কোল ঘেঁষে হাতুড় ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের দেয়ানপুর গ্রামে ওঁরাও সম্প্রদায়ের বাস। আত্রাই নদীর বালুচরের জমি তাদের দখলে ছিল। এখন চর তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। খাস জমি দেখিয়ে চতুর অনেক বাঙালি লিজ নিয়ে নিচ্ছে। তারা এ জমি রক্ষার জন্য মামলা করেছে। ওঁরাওদের এ গ্রাম থেকে উচ্ছেদের প্রায়ই হুমকি আসে। পাশের লতিফপুর ইউনিয়নের বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক এসে তাদের কবরস্থান দখল করে নিয়েছিল। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কবর স্থান নিজেদের দখলে এনেছে। এখন তারা সেখানে বনজ গাছ লাগিয়ে দিয়েছে। পাহাড়া বসিয়েছে। এ গ্রামের অবস্থা প্রসঙ্গে রবিন চন্দ্র ওঁরাও বলেন, 'আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রায়ই হুমকি আসে। জমি দখল করে নেয়। কবর স্থানও ওরা দখল করে নিয়েছিল। আমরাও এখন বসে নেই। এ জমি, এ গ্রাম আমাদের। এই মাটিতে থেকে আমরা বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছি।' ওঁরাও পল্লী ঘুরে দেখা গেল, ছোট ছোট মাটির ঘর। বেশ পরিচ্ছন্ন। নারী-পুরুষ উভয় জমিতে কাজ করে। তবে নারীরা এখন সমিতি করেছে। সমস্যা এক সঙ্গে মোকাবেলার সাহস সঞ্চয় করেছে। যুবকরা মিলে যুব সংঘ গড়ে তুলেছে।

মহাদেবপুরের বিভপুর জোতদারদের হাত থেকে জমি রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে আলফ্রেড সরেন নিহত হন ২০০০ সালের আগস্ট মাসে। আজও তার হত্যা মামলার সুরাহা হয়নি। আসামিরা হাইকোর্ট থেকে তিন মাসের মামলা স্থগিত আদেশ নিয়ে এসেছে। জামিন পেয়েছে। এ গ্রামের আদিবাসীরা এখন আসামিদের ভয়ে আতঙ্কে রয়েছে। এক মেয়েকে নিয়ে আলফ্রেড সরেনের স্ত্রী জ্যোৎস্না সরেন অসহায় হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, জোতদার হাসেম আলীর পক্ষের লোকেরা বিবাদের জমি এখন দখল করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের কাছে আলফ্রেড সরেন এখন সংগ্রামের প্রতীক। তেমনি সংগ্রামের পরিনতি ভেবে তারা উদ্বিগ্ন।

মহাদেবপুর থেকে মাইক্রোবাসে আমরা নিয়ামতপুরের দিকে রওনা হই। ৫ নবেম্বর সন্ধ্যায় নাচোলের দিকে চলে যাওয়া একটি সরু রাস্তা ধরে আমাদের মাইক্রোবাসটি এগোতে থাকে। দু'পাশে শুধু ধান ক্ষেত।

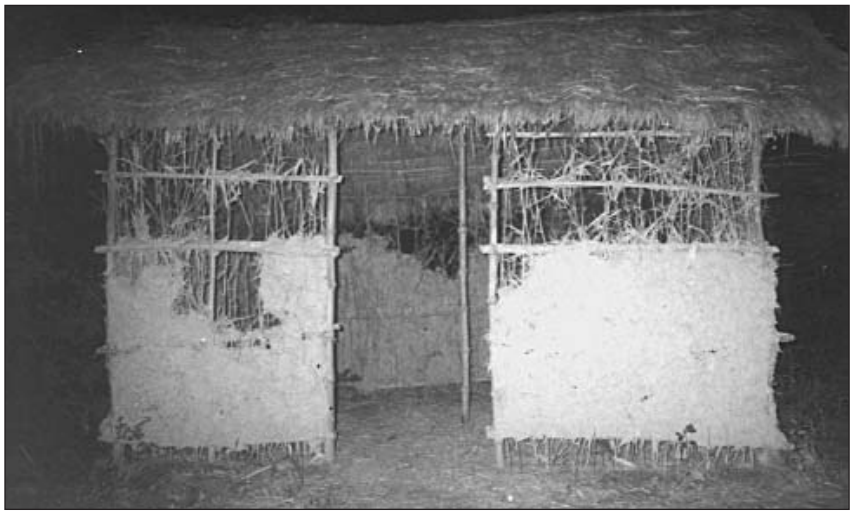

নেয়ামতপুরে আদিবাসীর বাড়িতে জনৈক রইজ জোরদার ঘর তুলেছে

পাকা ধানের ভরে জমিতেই ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে। পাখির কলতান। সর্বত্র সবুজের সমারোহ এক নৈসর্গিক পরিবেশ। রাত ৯টায় রাজোয়ার পল্লী পুরাউল গ্রামে পৌঁছাই। এ গ্রামের এক বাড়িতে ৬০/৭০ ঘর রাজোয়ারা বাস করে। পাশের সমায়েশপুর গ্রাম থেকে রইজ মিয়া এসে এ বাড়ি তার বলে এখন দাবি করছে। বাড়ির ভেতরে জোর করে ঘর বানিয়েছে। আদিবাসীরা জানায়, রাতে এ বাড়িতে এসে তার লোকেরা মদ খায়। আদিবাসী মেয়েদের উত্যক্ত করে। কিছু বললে আদিবাসীদের তার লাঠিয়ালরা মারতে আসে। পুকুরে মাছ ধরা, গাছ থেকে ফল পাড়ার জন্য থানায় সে মামলা দিচ্ছে। থানার পুলিশ তার পক্ষ হয়ে আদিবাসীদের হয়রানি করছে। এ পল্লীর আদিবাসী যুবকদের ওপর তিনটি মামলা ঝুলছে।

নিয়ামতপুর আসর গ্রামে ১০ ঘর আদিবাসী সাঁওতাল বাস করে। নাচোলের জনৈক ইঁদু মিয়া তাদের জমি জাল করে নিজ নামে করে নিয়েছে। সে কোর্ট থেকে উচ্ছেদের ডিগ্রি আনে। ২৫ জুন ২০০১ সালে থানা থেকে ৬ জন পুলিশ আসে আদিবাসীদের উচ্ছেদে। সঙ্গে তাদের ইঁদু মিয়ার লাঠিয়াল। কয়েক গ্রামের সাঁওতালরা মিলে এ উচ্ছেদ প্রতিরোধ করে দেয়। বরেন্দ্র ভূমি উন্নয়ন সংস্থা (বিডিও) এখন সাঁওতালসহ নেয়ামতপুরের আদিবাসীদের জন্য কাজ করছে। তারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করছে। উচ্ছেদ

আদিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। অক্সফেমের সহযোগিতায় বিডিও কয়েকটি আদিবাসী সন্তানদের জন্য প্রাক প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। বিডিওর সহযোগিতায় আদিবাসীরা ন্যূনতমভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

ইলা মিত্রের নাচোল। আজও স্থানীয় আদিবাসীদের প্রেরণার উৎস। নাচোলের সাঁওতালদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জমি হারিয়ে তারাও ক্রমে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। তাদের সাহায্যের কেউ নেই। ইলা মিত্র ২০০০ সালে নাচোলে এসেছিলেন। নাচোলের সাঁওতালদের নিঃস্ব করে দেয়ার এ ধারাবাহিকতায় তিনি ব্যথিত হন। ইলা মিত্র আজ বেঁচে নেই। নাচোলের সাঁওতালরা তাকেই এখন তাদের সংগ্রামের প্রতীক মনে করে।

নাচোল বাজার থেকে স্কুটার ভাড়া করে রাজশাহীর গোদাগাড়ির দিকে রওনা দেই।

বেঁচে থাকার জন্য আদিবাসীরা সংগঠিত হচ্ছে

দেড় ঘন্টা পর আমরা গোদাগাড়ির বান্দারা ইউনিয়নে পৌঁছাই। এখানে আদিবাসী পল্লীতে চলছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। বান্দারা গ্রামের সাঁওতালদের বাড়ি স্থানীয় কাকন কলেজের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম লিজ নিয়েছে বলে দাবি করছে। সে প্রতিনিয়ত বাড়ি থেকে আদিবাসীদের চলে যাবার হুমকি দিচ্ছে। বাড়ির আম পাড়ার জন্য তিনি ৯ আদিবাসী যুবকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দেয়। এ মামলায় হাজিরা দিতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট আদিবাসী যুবকদের জামিন না দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তারা ৬ মাস জেল খেটে এসেছে।

ঋষিপুর ইউনিয়নের আদারপাড়া গ্রামের আদিবাসীদের কবরস্থান দখল করে নেয়া হয়েছে। কবর স্থানে গড়ে উঠেছে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের বসতি। আদিবাসী সাঁওতালরা এখন কবর দেয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। দাতনীপাড়ার ওঁরাও সম্প্রদায়ের মন্দির, বটবৃক্ষটি দখল হয়ে গেছে। এ এলাকায় আদিবাসীদের আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) আইনী সহায়তা দিয়ে আসছে। সংস্থার কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, পুরো এলাকায় আদিবাসীদের জমি দখলের তৎপরতা চলছে। তবে আদিবাসীরা জমির বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক সচেতন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মূলত জমি, বাড়ির রেজিস্ট্রেশন নেই। রয়েছে তাদের উত্তরাধিকারী সূত্রে দখলি স্বত্ব। বাঙালি জোতদার ও টাউটেরা মিলে এ জমিকে সেটেলমেন্ট অফিসে প্রথমে খাস দেখায়। তারপর অর্থের বিনিময়ে লিজ কাটে। এ লিজ কাটার পর দখলে যাবার জন্য আদালতে মামলা ঠুকে দেয়। সেখানেও নানা কৌশলে তারা ডিগ্রি পেয়ে যায়। তারপর থানার পুলিশ ও লাঠিয়াল এনে কথিত আইনিভাবেই আদিবাসীদের উচ্ছেদে আসে।

এ প্রসঙ্গে বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল রউফ বলেন, 'আদিবাসীরা প্রচলিত আদালতে আইন জানে না। তারা খুবই সহজ-সরল। তাদের সরলতার সুযোগ অনেকেই নিচ্ছে। আমরা তাদের আইনি সহায়তা দিচ্ছি। ভূমি সমস্যাই তাদের মূল সমস্যা। এ কারণে সরকারের উচিত আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বসতবাড়ি ও ভূমি তাদের নামেই করে দেয়া। তিনি বলেন, শুধু ভূমি নয়, বাঙালি জনগণের চাপে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামে সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং বলেন, 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমির ওপর ঐতিহ্যগত অধিকার রয়েছে। সরকারের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা আদিবাসীদের ভূমির অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করছি।' নওগাঁর জেলা প্রশাসক এস রইজ উল আলম বলেন, 'আদিবাসী জমি নিয়ে সমস্যার কথা শুনেছি। সরকারের নির্দেশ আছে, তারা যাতে ভূমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা।'

আদিবাসী : প্রয়োজন বেঁচে থাকার অধিকার

ইউনিভার্সেল ডিকলারেশন অব হিউম্যান রাইটস নামে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের একটি সনদ অনুমোদিত হয়। সনদের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের এককভাবে অথবা অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কাউকে খুশি মতো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বাংলাদেশ এ সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। আইএলও কনভেনশনের ১৪ ও ১৬ নং ধারায় ঐতিহ্যগত প্রাপ্ত জমির ওপর সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ঐ জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না। যদি কোনো কারণে উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট ও বৈধ জমি প্রদান করতে হবে। দেশের সংবিধানে ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম গোষ্ঠী বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। অথচ এদেশের আদিবাসীরা হয়ে পড়ছে নিজ ভূমে পরবাসী। সর্বত্রই তারা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। মৌলভীবাজারে খাসিয়াদের পাহাড়ের পুঞ্জি দখল করে নেয়া হচ্ছে। হাজার বছরের বসত পুঞ্জি রক্ষার তারা আন্দোলন করে চলেছে। ময়মনসিংহ মধুপুরের গারোদের ওপর বনবিভাগের হয়রানি চলছে। বহিরাগতদের আগমনে তারা ক্রমেই হয়ে পড়ছে নিজ গ্রামে সংখ্যালঘু। সিলেট, পটুয়াখালীর মনিপুরীরা ধর্মীয় আগ্রাসনের শিকার হয়ে দেশ ছাড়ছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ে অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। নানা বঞ্চনায় বৃহত্তর রাজশাহীর আদিবাসীরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। বঞ্চনার ভয়াবহতা সমতলের আদিবাসীদের প্রতিরোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুলছে।

মূলত '৪৭-এ দেশ বিভক্তির পর থেকেই এ দেশের আদিবাসীরা বঞ্চনার শিকার হয়। কতিপয় নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আদিবাসীদের বাঙালি জাতির পূর্বসূরির মর্যাদা না দিয়ে তাদের বহিরাগত উপজাতি বলে মূল জাতিসত্তা থেকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন।

আদিবাসীরা এ দেশের ভূমিজ সন্তান। তাদের নিরাপত্তা প্রদান ও উন্নয়ন সাধনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অক্সফেমের সহায়তায় বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, বরেন্দ্রভূমি উন্নয়ন সংস্থা, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা বৃহত্তর রাজশাহীর আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়। তবে তাদের এ চেষ্টা হাজার সমস্যায় জর্জরিত আদিবাসীদের টিকিয়ে রাখার জন্য যৎসামান্য। এ কারণে দেশের সবচেয়ে বঞ্চিত রাজশাহীর আদিবাসীদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে বঞ্চনা বিদ্রোহের জন্ম দেবে। যেটা কারোরই কাম্য নয়।